Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 138-144
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.057

সাঁওতাল জনমানসে 'বাহা' (বসন্ত উৎসব): একটি পর্যবেক্ষণ

মঞ্জুশ্রী মুর্মু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper discussed the Baha festivel. One of the major festivel of the Santali tribal community. Which is on important part of their social and cultural life. Baha is the second largest festivel of the santals. Through the baha festivel they worship nature. Santals have placed nature on the through of god. This baha festivel is an expression of emotions and fellings centered around nature.

Keywords: Santals, Culture, Festivel, Baha, worship.

আদিবাসী (Indigenous বা Tribe) বলতে আমরা বুঝি আদিম অধিবাসী বা জনগোষ্ঠী। যারা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। এই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হল সাঁওতাল। যারা মূল ধারার সমাজে বন্য, অরণ্যচারী, শিকারজীবী জাতি রূপে পরিচিত। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিকগণ এদের দৈহিক গঠন, মুখাকৃতি, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র জাতি রূপে তাদের চিহ্নিত করেছে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুল সুর প্রমুখের মতে সাঁওন্ত পরগণায় বসকালে এদের নাম হয় সাঁওতাল। আবার প্রখ্যাত সাঁওতাল গবেষক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের মতে সাঁওতাল তাদের নিজেদের দেওয়া নাম নয় অন্য সমাজের মানুষ তাদের এই নামকরণ করেছে। তাঁর মতে সাঁওতালরা নিজেদের যারা খেড়োয়াল বলে অভিহিত করে। দিকো বা অন্য সমাজের মানুষের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে নিজেদের হড় বলতে বেশি অভ্যস্ত। অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মূল ধারার সংস্কৃতি থেকে পৃথক এক সংস্কৃতি। এদের সংস্কৃতি নির্মিত হয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতি তাদের জীবন যাপনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত। রীতি-নীতি ধর্মকর্ম, পাল-পার্বণ, উৎসব, পরব সবকিছুই নির্মিত হয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই তাদের বেড়ে ওঠা। প্রকৃতি তাদের কাছে ধরিত্রীর সমান। অর্থাৎ বলা যায় তাদের জীবনের চালিকা শক্তি এই প্রকৃতি। এই সরলপ্রানা মানুষরা বছরের প্রতিটি সময়ে উৎসব পালন করে থাকে। বাঙালীর মতন বারো মাসের তেরো পার্বণ ন্যায় তাদের সমাজেও নানান সারম্বরে উৎসব পালিত হয়। সাঁওতালদের উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম হল সহরায়, বাহা, দাঁসায়, কারাম, সাকরাত, মাকমড়ে প্রভৃতি। প্রতিটি উৎসব তাদের সমাজে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে উদযাপিত হয়।

আমার এই প্রবন্ধে মূল আলোচ্য বিষয় হল সাঁওতালদের বাহা পরব ফুলের (উৎসব)। এটি সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান উৎসব। বাহা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ফুল। অন্যভাবে বলতে গেলে বসন্ত ঋতুতে ফাল্গুন মাসে যখন গাছে গাছে নতুন পাতা ডানা মেলে, নতুন ফুলে ভরে ওঠে, প্রকৃতি তার আলোকবর্ষিত শোভা

নিয়ে মানুষের দ্বারে এসে উপস্থিত হয় ঠিক তখনই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এই মানুষগুলোর জীবনে এক নতুন বার্তা নিয়ে আসে। প্রকৃতির এই বার্তা সাঁওতালদের কানে কানে জানিয়ে দেয় বাহা পরবের আগমন ধ্বনি। বাঙালীরা যখন বসন্ত উৎসবের প্রাক্কালে রং আর আবীর নিয়ে পরস্পরকে রাঙিয়া নেওয়ার চেষ্টায় মেতে ওঠে। সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা তেমনি এই বসন্ত উৎসবের মধুর ধ্বনিতে নিজেদের রাঙিয়ে নেয়। এই উৎসব সাঁওতালদের কাছে প্রকৃতি প্রেমের এক অনন্য রূপ। প্রকৃতির সঙ্গে এক ঐকান্তিক মিলন। সাঁওতাল সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সেতু নির্মাণ করে এই উৎসব। প্রকৃতি যে তাদের কাছে মাতৃসম তাদের উৎসব গভীরভাবে অনুধ্যান করলে বোঝা যায়। এই উৎসব সম্পূর্ণ না হলে তারা নতুন পাতা, ফুল ছেঁড়ে না, কোন ফুল মাথায় দেয় না। সাঁওতালদের এই কার্য প্রণালী প্রমাণ করে প্রকৃতির প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা। বাহা পরবের নির্দিষ্ট কোন দিনক্ষণ থাকেনা। বাঙালীদের মতন দিনপঞ্জিকা ধরে অনুষ্ঠিত হয় না। এই সমাজে যিনি প্রধান অর্থাৎ সর্দার নির্বাচিত হন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী উৎসবের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। সাঁওতালরা যাকে মাঝি হারাম (মোড়ল) বলে তারই নির্দেশে একটি নির্দিষ্ট দিনে গোডেৎ গ্রামে এক সভার ডাক দেন। গ্রামের সকলের মতামত অনুযায়ী উক্ত সভায় একটি নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য হয়। সাধারণত ইংরেজি ফ্রেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ বাংলা ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি করে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন অঞ্চলে একটি পৃথক পৃথক দিনে উদযাপিত হয়। কোথাও তিনদিন আবার কোথাও দুইদিন বাহা উৎসব পালন করা হয়। উৎসবের দিনগুলি এইভাবে নির্দেশিত হয়, প্রথম দিনকে বলা হয় উম নারকা, দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় সারদি এবং তৃতীয় দিনকে বলা হয় বাস্কে।

উম নারকা (পরিষ্কার ও পরিচ্ছনতার দিন): উৎসবের প্রাকপর্ব থেকেই সাঁওতাল গ্রামে প্রতিটি ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়। মাটি, গোবর এবং খড় পুড়িয়ে নিজ রঙ তৈরি করে ঘর সাজিয়ে রঙবেরঙে মলাটে সাজিয়ে তোলা হয়। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রতিকৃতি যেমন; পশুপাখি, গাছ-পাতার চিত্র দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়। জাহের থান ও উৎসবস্থল গোবর দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করা হয়। জাহের স্থানের আশেপাশে খড়, দড়ি দিয়ে আমপাতা বেঁধে দেওয়া হয়। একটি শাল মহুয়া বা মহুয়া গাছকে ঘিরে ছামডা বা গৃহ তৈরি করা হয়। গ্রামের নাইকে (পুরোহিত) যিনি উৎসবের প্রধান প্রথমদিন স্নান করে, নতুন পোশাক পড়ে উপবাসের মাধ্যমে নিজেকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত করেন। উৎসবের আগের দিন রাত্রিবেলা নাইকে- কে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে অন্য কোন স্থানে রাত্রি যাপন করতে হয়। গ্রামের প্রধানরা যেমন; মাঝি হারাম (হেডম্যান), জগমাঝি (সহকারী হেডম্যান), গোডেৎ (আহ্বায়ক), নাইকে (পুরোহিত), কুডম নাইকে (সহকারী পুরোহিত) ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে জাহের থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। ওইদিন নাইকে এবং মাঝি বাবা জাহের থানে নৈবিদ্য পূজা- অর্চনা করেন। 'মারাংবুরু', 'জাহের এরা', 'মড়ে ক তুরুইক' পভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা হয়। যে পূর্বপুরুষরা জাহের থান নির্মাণ করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গা বা পূজা করা হয়। এরপর একটা শাল গাছের নীচে স্থান নাইকে (পুরোহিত) চিহ্নিত করেন। এই স্থানকে বলা হয় জাহের চালা বা স্থান। সাঁওতালদের কাছে এই স্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। ওই শাল গাছের নীচে বা জাহের স্থানে সমবেত হয়ে তারা বাহা উৎসব পালন করে। সাঁওতালদের লৌকিক বিশ্বাস যে, পূজার স্থানগুলি তাদের পূর্বপুরুষরা রক্ষা করছে। সন্ধ্যায় শাল গাছের নীচে ধামসা, মাদল সহকারে সাঁওতাল নারী-পুরুষ উভয়ে নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করে। ওইদিন গ্রামের প্রতিটি পরিবার নিজের মেয়ে- জামাইদের উৎসবে আসার জন্য আমন্ত্রন করে।

রিতরিতি রৌংকিলো
তিঞগরে মুন্দোম দ,

রিতরিতি রৌংকিলো
জাঙ্গাঞরে নিউরৌ
তকর তাম নৌজিঞ হো
তিঞগরে মুন্দৌম দ,
তকর তাম নৌজিঞ হো
জাঙ্গামরে নিউরৌ
সুঃদাঃকরেঞ ঞুরকেদা
তিঞগরে মুন্দৌম দ
ডৌডি দাঃকরেঞ হসরকেদা
জাঙ্গাঞরে নিউরৌ
গাতেঞ চয় হালাঙকেদা
তিঞগরে মুন্দৌম দ
সাঙ্গাঞচয় তসাঙকেদা
জাঙ্গাঞরে নিউরৌ
এমকাতায় মেতায়পে হো
জাঙ্গাঞরে নিউরৌ
গাতেমরে হঁ বানুঃক আনাঙ
তিঞগরে মুন্দৌম দ
সাঙ্গামরে হঁ বানুঃক আনাঙ
জাঙ্গামরে নিউরৌ।

কি সুন্দর দেখতে ওগো হাতের আংটি, কি সুন্দর দেখতে ওগো পায়ের নূপুর। ওগো দিদি, তোমার আংটি কোথায়? ওগো দিদি তোমার পায়ে নূপুর কোথায়? বালির খোঁদা জলে হাতের আংটি পড়ে গেছে, বালির খোঁদা জলে পায়ের নূপুর পড়ে গেছে। হয়ত আমার প্রিয়তম কুড়িয়েছে আমার হাতের আংটি, হয়ত জামাইবাবুর ভাই নিয়ে পালিয়েছে আমার পায়ের নূপুর। ওগো তোমরা সমর্পণ করতে বল আমার পায়ের নূপুর। তোমার প্রিয়তমের কাছে নেই তোমার আংটি, তোমার সাঙার কাছেও নেই পায়ের নূপুর।

(বাংলা অনুবাদ)

দ্বিতীয় দিন: সার্দিমাহা পূজা বা মূল উৎসবের দিন— দ্বিতীয় দিনের সকালে মাঝি বাবা ও নাইকে (পুরোহিত) গ্রামের যুবকদের শাল ফুল সংগ্রহের জন্য আদেশ করে। অপরদিকে নাইকে গ্রামের অন্যান্য নারী- পুরুষদের নিয়ে জাহের থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই দিনে নাইকে (পুরোহিত) কে নানান বিধি বিধানের মধ্য দিয়ে থাকতে হয়। বিধান অনুসারে নাইকে তিনটি জাহের স্থান নির্মাণ করেন। একটি জাহের এরা, মারাং বুরু, মড়ে ক তুরুই ক জন্য, দ্বিতীয়টি গোসারির জন্য, এবং তৃতীয়টি মাঝি বোঙ্গার জন্য। 'জাহের এরা' হল গ্রাম্য দেবী, সাজসজ্জা হিসেবে শিকলি মালা, মাথায় মহুয়া গাছের ডাল ও এক হাটে ঝাঁটা ধারণ করে। 'মারাং বুরু' টাঙ্গি এবং মড়ে ক তুরুই ক হাটে তীর ধনুক ধারণ করেন। এরপর নাইকে প্রত্যেকটি স্থান সুন্দরভাবে গোবর দিয়ে পরিষ্কার করে নেন। এই দিন গ্রামের যুবকেরা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে শিকারে বের হয়। নাইকে (পুরোহিত) পূজার সামগ্রি হিসেবে চাল, শাল ফুল, মহুয়া ফুল, ধূপ, দুব্ব ঘাস সহকারে পূজা কার্য আরাম্ভ করেন। শাল, মহুয়া, এবং অন্যান্য নতুন ফুল দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। নাইকে জাহের থানে

পূজা নিবেদনের মধ্য দিয়ে বঙ্গা বা দেবতাদের কাছে সকল গ্রামবাসীদের জন্য মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন। নারী-পুরুষ যারা প্রতিদিন জঙ্গল, নদী, মাঠে নিত্য নৈমত্তিক কর্মে যায় তারা যেন সুরক্ষিত থাকে এবং কল্যাণময় আত্মা তাদের সমস্তরকমের অশুভ আত্মা থেকে রক্ষা করতে পারে। পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম হিসেবে নাইকে এবং গ্রামবাসীগণ মিলে সোরে বা খিচুড়ি রান্না করে। খিচুড়ি দেবতাকে উৎসর্গের পর তারা সকলে মিলে তা গ্রহণ করে। ভোজ কর্ম সমাপ্ত হওয়ার পর নাইকে নাইকে 'এরা' (নাইকের স্ত্রী) পা জল দিয়ে ধুইয়ে দেয় এবং এই সময় শাল ফুল বিতরণ করে। অন্যদিকে গ্রামের নারীরাও সমবেত হয়ে নাইকে পা ধুইয়ে দেয় এবং পায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। পা ধোয়ার কাজটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাপ্ত হলে গ্রামের নারীরা নাইকের কাপড়ে ভাঁজ করা ফুলের গোছাটি সংগ্রহ করে। এরপর গ্রামের একজন অবিবাহিত জোয়ান পুরুষ কাঁধে জল বহন করে, তারপর নাইকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করার পর সেই জল সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। নাইকের কাছ থেকে পাওয়া কিছু সংখ্যক শাল ফুল মহিলারা তাদের চুলের খোঁপায় পরিধান করে, পুরুষেরা কানের দুইপাশে আটকে দেয়। বাকি শাল ফুল খড় এবং টালির ছাদে গুঁজে দেওয়া হয়। এর লক্ষণ হল যে, সেই গ্রামটি বাহা উৎসব পালন করছে। এরপর সন্ধ্যায় গ্রামের নারী-পুরুষরা জাহের থানে সমবেত হয়ে ধামসা, মাদল সহকারে গীত-নৃত্য করে।

হেসাঃক মা চটেরে
জা গোঁসাই তুদে দোএ রাগে কান,
বাড়ে মা লাওয়ের রে
জা গোঁসাই গতরুঃৎ দয় সাঁহেদা।
দেশ চঙ নিচুরেণউ
জা গোঁসাই গুতরুঃৎ দয় সাঁহেদা
দেশ চঙ নিচুরেণ
জা গোঁসাই গুতরুঃৎ দয় সাঁহেদা
আচুরতে হঁ আচুরেন
জা গোঁসাই তুদে দয় রাগে কান
বিহুরতে হঁ বিহুরেণ,
জা গোঁসাই গুতরুঃৎ দয় সাঁহেদা
অকয়মে দয় নাকাড় ওয়াদে
জা গোঁসাই তুদে দয় রাগে কান,
তকয় মে দয় দান্দেওয়াদে
জা গোঁসাই গুতরুঃৎ দয় সাঁহেদা
মঁড়েকোকো নাকাড় ওয়াদে
জা গোঁসাই তুদে দয় রাগে কান,
তুরুইকোকো দান্দে ওয়াদে
জা গোঁসাই গুতরুঃৎ দয় সাঁহেদা
নাকাড়তে হঁয় নাকাড়ওয়াদে
জা গোঁসাই তুদে দয় রাগে কান,
দান্দেতে হঁয় দান্দেওয়াদে

জা গোঁসাই গুতরুঃৎ দয় সাঁহেদা।

অশ্বথ গাছের মগডালে উঠে 'তুঃৎ' (ভরত পাখি) পাখি গান গাইছে। বট গাছে (বাড়ে মা) নীচে শায়িত ছোট কুকুরটা গওতরুৎদয় (এক জাতীয় কুকুর) শিস দেবার মতো নিঃশ্বাস নিচ্ছে)। ওগো গোঁসাই দেশ (বছর) ঘুরে যায়, ওগো গোঁসাই, তুঃৎপক্ষী ডাক দেয়, দেশ বিবর্তন হয় গো গোঁসাই ছোট কুকুরটি শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে। বছর ঘুরে যায়, ওগো গোঁসাই, ছোট কুকুরটি শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে।

(বাংলা অনুবাদ)।

'সারলে সাগুন লে হো
বির দিশম দ
দাঁড়ালে নাচুরলে হো
আতোমা ডিহ'।

(শুভাশুভ এই জঙ্গল বেষ্টিত মাতৃভূমি। তার পাদদেশেই গ্রাম পত্তন সমীচীন)।

তৃতীয় দিনঃ জালে মাহা বা খাওয়া-দাওয়ার দিন— এই শেষদিনে 'বাহা' উৎসবের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে। সাঁওতাল সমাজের আবাল বৃদ্ধবনিতার কাছে আজকের দিনটি বিষাদের দিন। তিনদিন দিন ধরা চলা উৎসবের আমেজে ভাটার টান পরে। এইদিন গ্রামের সকলে খোলা স্থানে সমবেত হয়ে একসঙ্গে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সামগ্রী রান্না করে, সেই খাদ্য আনন্দ সহকারে সকলে গ্রহণ করে। মেয়ে-জামাইদের বিদায় দেওয়ার পূর্বে পরিবারের সকলে ধামসা, মাদল সহকারে শেষ রাত্রিব্যাপি নৃত্য-গীতে সকলে অংশগ্রহণ করে। একদিকে আনন্দ, উন্মাদনা অন্যদিকে বিরহের সুর ধ্বনিত হতে থাকে সমগ্র সাঁওতাল গ্রামে।

তকয় মা রাচারে না
রৌংগি পণ্ডেগর সাদম দ?
তকয় মা বাটেরে না
রৌংগি পিয়ৌরে ঘুড়ি?
নায়কে মা রাচাবে না
রৌংগি পণ্ডেগর সাদম দ,
নায়কে মা বাটেরে না
রৌংগি পিয়ৌরে ঘুড়ি।
লিকিদে লিকিদে না
রৌংগি পণ্ডেগর সাদম না
দমগে দমগে না
রৌংগি পিয়ৌরে ঘুড়ি
তলায়তাম ঘুঘুড়া না
রৌংগি পণ্ডেগর সাদম দ
নিয়ৌড়ায়তাম উরমৌল না
রৌংগি পিয়ৌরে ঘুড়ি।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা নাইকের বাড়িতে সমবেত হয়ে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পরে তারা সমবেত হয়ে মাঝির ঘরে লাঁগড়ে (সেরেং) গানের তালে নৃত্য গীত করে। নৃত্য গীত পর্বের সমাপ্ত কালে তারা বিষাদ মুখরিত হৃদয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যায়। এইভাবে বাহা উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাহা উৎসবের তত্ত্বকথা:

বাহা উৎসব সম্পর্কে সাঁওতালদের লোক প্রচলিত কাহিনীতে বলা হয়েছে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন জঙ্গল আর জঙ্গল ছিল, সেই কালে জঙ্গলের বড়ো গাছে কোটরে বোঙ্গা বা দেব-দেবীরা বসবাস করত। তৎকালে সাঁওতালদের বারোটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র টুডুরা লোহা-লক্কড়ের কাজ করত। এই কাজের জন্য প্রতিদিন তারা নিয়ম করে কাঠ কয়লা সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যেত। একদিন যখন তারা কাঠ কয়লা সংগ্রহ করেছিল, তৎসময় পর্বে দুই টুডু যুবক দেখতে পায়, বেশ কয়েকজন দেব-দেবী নৃত্য নৃত্য করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে এই দৃশ্য দেখে দুই সাঁওতাল যুবক অন্ত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং ভয় পেয়ে যায়। অত্যধিক ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে গেয়ে তারা সেই স্থান থেকে পালিয়ে যায়। দৌড়ানোর প্রাক্কালে তারা আতঃনাক গাছ দেখতে পায় এবং দিকবেদিক শূন্য হয়ে সেই গাছের কোটরে প্রবেশ করে। এই আতঃনাক গাছ যে দেব-দেবীর আদি বাসস্থান তা ওই টুডু যুবকদ্বয় কল্পনা করতে পারেনি। দুই যুবক লক্ষ্য করে দেব-দেবীরা তাদের অনুসরণ করতে করতে তাদের বাসস্থানের কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং গাছের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করতে করতে নৃত্য করতে শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে যুবকদ্বয় ভয়ানক ভাবে ভয় পেয়ে যায়। কম্পিত হৃদয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্ব শুরু করে— একজন টুডু যুবক অপর যুবককে বলে আজ আমরা দেব-দেবীর বাসস্থানে প্রবেশ করেছি, আজ আমরা যাই করি না কেন এই জাঁতাকল থেকে আত্মরক্ষার উপায় নেই। উপায়ন্তর না পেয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় দেব-দেবীদের সঙ্গে নাচ করার। তারা লক্ষ্য করল দেব-দেবীরা সবাই উলঙ্গ হয়ে নাচানাচি করছে। এই ভয়াল দৃশ্য দেখে যুবকদ্বয় তীব্র সুরে চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার চিৎকার করতে করতে তারা দেব-দেবীদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদের খুশি করার জন্য উদ্যোগী হয়। তারা জঙ্গল থেকে ফুল সংগ্রহ করে দেবদেবীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যুবকদ্বয়ের হাতে ফুল দেখে দেবীরা আত্মসংযম হারিয়ে ঘাড় নিচু করে নাচতে থাকে। ফলস্বরূপ যুবকদ্বয়ের প্রতি অতিশয় আনন্দিত হয়ে তাদের কাজকর্ম এবং নাচগান শেখাল। দেব-দেবীরা নিজেদের নাম অত্যন্ত সন্তর্পণে পরস্পর তাদের জানাল— জাহের এরা, মারাংবুরু, মড়েকো-তুরুইকো, গোঁসাই এরা, পারগানা বোঙ্গা প্রভৃতি।

টুডু যুবকদ্বয় ধীরে ধীরে দেব-দেবীদের কাছ থেকে সমস্ত কিছু শিক্ষালাভ করতে শুরু করল। দেব-দেবীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরে তারা স্বভাষী মনুষ্য সমাজে তা প্রচার করতে শুরু করল এবং তাদের দেব-দেবীদের দেওয়া শিক্ষায় শিক্ষিত করতে শুরু করল। টুডু যুবকদ্বয়ের অর্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি দেখে দেশের মানুষ আশ্চর্য চকিত হয়ে যায়। কথিত আছে তারপর থেকেই বাহা উৎসবের শুভারম্ভ হয়।

আর একটি লোক কাহিনীতে থেকে জানা যায়, ভারত উপমহাদেশে প্রাগৈতিহাসিক কালে হড় বা সাঁওতাল ছাড়া কেউ ছিল না। সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর টুডু গোত্রের লোকেরা কামারের পেশায় নিযুক্ত ছিল। একদিন টুডু গোত্রের দুই যুবক লোহার কাঁচামাল করে সংগ্রহের জন্য জঙ্গল থেকে বাড়ি ফেরার সময় পথপ্রান্তে তারা তিনজন দেবীকে নৃত্যরত দেখল। ওই সন্ধিক্ষণে দেবীদের সম্মুখপ্রান্তে মড়েকো তুরুইকো দেবতারা 'সগয়' করছিল। দেবীদের খোঁপা সজ্জিত ছিল শাল ফুলে। যুবকদ্বয় এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ডুমুর গাছের কোটরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজেদের আত্মরক্ষার উপায়ন্তর না করতে পেরে তারা দেব-দেবীদের নৃত্যরত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সগয় করতে শুরু করে। একজন যুবক 'সগয়' করার সময় দিকবেদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একজন দেবীর বুকে হাত স্পর্শ করে। দেবী লক্ষ্য করল যুবকের স্পর্শে তার স্তনে কালো দাগ পড়েছে। দেবী তা উপেক্ষা করে অন্যান্য দেবীদের ঘাড় ধরে নাচতে শুরু করল। যখন ভোর হল তখন দেবীগণ দুই যুবককে বলল— তোমরা আমাদের সঙ্গে নেচেছ সুতরাং তোমরা উৎসব করো। দেবীদের এই কথা শুনে তারা ভাবতে শুরু করল সেই উৎসবের কি নাম রাখা যায়?

যুবকদ্বয়ের এই কথা শুনে দেবীরা বলল— আমরা যেহেতু মাথায় ফুল গুঁজে নৃত্য করেছি, সেহেতু সেই উৎসবের নাম রেখো 'বাহা'। সেই সময়পর্ব থেকেই সাঁওতাল সমাজে বাহা উৎসবের সূচনা হয়।

সাঁওতাল তথা আদিবাসীদের প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে ভূমি, পরিবেশ, প্রকৃতি, ঋতুচক্র, ফসল উৎপাদনের খুবই নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাদের বিভিন্ন উৎসব থেকে প্রকৃতির কোন সম্পদ কোন সময় ব্যবহার করতে হবে, তার সহজেই নির্দেশনা পাওয়া যায়। 'বাহা' উৎসব সেই প্রকৃতি ভাবনারই নামান্তর। বসন্তে প্রকৃতি যখন পূর্ণ বিকশিত হয়ে অপরূপ সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই সাঁওতালরা প্রকৃতিকে স্নেহের পরশে আলিঙ্গন করে নেয়। দেবতা জ্ঞানে পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃতিকে গ্রহণ করে। 'বাহা' উৎসব সাঁওতালদের প্রকৃতি ভাবনার অনবদ্য রুপায়ন বলা যায়। সরল, প্রাণবন্ত সাঁওতাল মানুষরা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র প্রকৃতি নয়, বরং দেবতা রূপে প্রকৃতিকে ধারণ করেছে। তবে সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই উৎসব পালনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বায়ন এবং প্রকৃতির সংকীর্ণতা এই উৎসব পালনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত বনভূমি ছেদন, ক্রমশ বনভূমি থেকে উচ্ছেদ সাঁওতালদের উৎসব পালনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকেই অরণ্যের অধিকার রাষ্ট্রীয়করণ হয়। রাষ্ট্রের পেষণযন্ত্রের থাবা নেমে আসে অরণ্যের বক্ষস্থলে। একদিকে সাম্রাজবাদী শক্তি, পুঁজিবাদী শক্তি আগ্রাসন ধীরে ধীরে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় জঙ্গলভূমিকে। ফরেস্ট অ্যাক্ট বা বনাধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জঙ্গলের একচ্ছত্র অধিকার কুক্ষিগত হয়ে যায় এক দল মানুষের কাছে। ফলস্বরূপ জঙ্গলের বিপন্নতার আঁচ নেমে আসে প্রকৃতিকে কেদ্র করে বেঁচে থাকা প্রকৃতি প্রেমী মানুষগুলোর জীবনে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের ফলে মানুষ অলীক মায়ার জাল বিন্যাসে আবদ্ধ হয়ে চিন্তনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটানোয় প্রকৃতি মাতার প্রতি তাদের ধ্যানজ্ঞান ক্রমশ তলানিতে ধাবিত হয়েছে। ফলে তিনদিনের উৎসব কোথাও দুইদিনে, কোথাও এক-দেড় দিনে সমাপ্ত হচ্ছে। ধামসা, মাদলের মত ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে কৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলত যে জৌলুস পূর্বে ছিল কোথাও যেন একটা ছেদ তৈরি হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। মিশ্র, অশোক, 'সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত', লোক প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৪ পৃ. ১৫০
২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩
৪। পূর্বোক্ত, ২০৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। রানা, কুমার, ও বাস্কি বড়ো, 'আদিবাসী ভারত', অনুস্টুপ, কলকাতা, ২০২৪
২। দাস, ক্ষুদিরাম, 'সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮